দিবানিশি ভাসি আমি : রামনিধি গুপ্ত

সরোজকুমার পান

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগীতকার তথা সংগীতসাধক রামনিধি গুপ্ত—সংগীত রসিক, সংগীত সাধক, সারস্বত পরিমন্ডল এবং সাধারণ্যে নিধুবাবু নামে যিনি সমধিক পরিচিত ও বরেণ্য। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না, যদিও বাংলা সাহিত্যে আত্মনিষ্ঠ ভাবের প্রবর্তনা ঘটেছিল তাঁরই সংগীতের মধ্য দিয়ে- এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তাঁর কাব্যেই প্রথম দেখা গিয়েছিল আধুনিক যুগের আভাস, পরবর্তী উনিশ শতকে যা স্পষ্ট হয়ে উঠে নতুন উষার স্বর্ণালোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলায় তথা ভারতবর্ষে সূচিত হওয়া রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান মর্মসত্য যে আত্মপোলব্ধি বা আত্মচেতনার জাগরণ তার একটা অস্পষ্ট সূক্ষ্ম আভাস মিলেছিল নিধুবাবু রচিত সংগীতগুলিতে। শাস্ত্র ও ধর্মের নিগড়-মুক্ত, দেহাতীত, উর্দ্ধায়িত, অধ্যাত্ম -বাষ্পায়িত, অতীন্দ্রিয় প্রেমভাবনা-বর্জিত তাঁর প্রণয় সংগীতগুলিতে দেহাশ্রয়ী ব্যক্তি প্রেমানুভূতির যে করুণ মধুর সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা-ই যে কালের ইথার তরঙ্গে ঘনীভূত তনীভূত হয়ে আধুনিক যুগের লিরিক কবিতার ভাবাবয়ব নির্মাণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। প্রাগাধুনিক যুগে রচিত নিধুবাবুর প্রণয় সংগীতগুলিতে মানবীয়তার যে অনতি-অস্পষ্ট সুর ধ্বনিত হয়েছে তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের কোন-কোন গানের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে।

১

নিধুবাবুর জীবনকথা আমরা সর্বপ্রথম জানতে পারি ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত মাসিক 'সংবাদ প্রভাকর' -এ (,১লা শ্রাবণ, ১২৬১ বঙ্গাব্দ /১৫ই জুলাই ১৮৫৪

খ্রিঃ)। জীবনের একেবারে অন্তিমকালে নিধুবাবু তাঁর স্বরচিত টপ্পা গানের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন 'গীতরত্ন' (১২৪৪ বঙ্গাব্দ) নামে। পিতার মৃত্যুর (১২৪৫ বঙ্গাব্দ/১৮৩৯ খ্রিঃ) বেশ কিছুদিন পরে ১২৬৩ বঙ্গাব্দে মধ্যমপুত্র জয়গোপাল গুপ্ত 'গীতরত্ন'-র দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন অংশে' এবং তারপর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে নিধুবাবুর জীবন কাহিনি বিবৃত করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল নিধুবাবুর জীবনী সংক্রান্ত ঈশ্বর গুপ্ত প্রদত্ত সংবাদ প্রভাকরের (১২৬১ বঙ্গাব্দ) তথ্য দু'বছর পরে প্রকাশিত নিধুবাবুর পুত্র (জয়গোপাল) সম্পাদিত 'গীতরত্ন'-র ভূমিকায় বিবৃত তথ্যের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবন কাহিনিকার (নিধুবাবু না তাঁর পুত্র জয়গোপাল) কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সম্ভবত তিনি পুত্র জয়গোপালের কাছ থেকেই নিধুবাবুর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশ করেছিলেন পরে সেই তথ্যই ব্যবহৃত হয়েছে জয়গোপাল সম্পাদিত 'গীতরত্ন'-র ভূমিকায়। যাই হোক না কেন, পূর্বোক্ত সূত্র থেকে নিধুবাবুর জীবনকথার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এরকম —

সমগ্র বাংলাদেশে নিধুবাবু নামে সুবিখ্যাত রামনিধি গুপ্তর জন্ম হয়েছিল ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে (১১৪৮ বঙ্গাব্দ) হুগলি জেলার ত্রিবেণীর কাছে চাঁপ্তা গ্রামে তাঁর পিতার মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে। এর পূর্বে তাঁর পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজ ও পিতৃব্য লক্ষীনারায়ণ কবিরাজ কলকাতার কুমারটুলিতে বাস করতেন। বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবি দৌরাত্মের কারণে তাঁরা সপরিবারে চাঁপ্তা গ্রামে পালিয়ে যান। তারপর ১১৫৪ বঙ্গাব্দে পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হলে তাঁরা পুনরায় কুমারটুলী ফিরে আসেন। রামনিধি তখন ছ'বছরের বালক। বাল্য ও কৈশোরে রামনিধি লেখাপড়া করেন কুমারটুলিতেই। সম্ভবত তিনি কোন মিশনারী সাহেবের কাছে কিছু ইংরাজিও শিখেছিলেন এছাড়া তিনি কিছু ফার্সী ও হিন্দিও জানতেন। কারণ ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী' থেকে জানা যায় শেষ জীবনে বার্ধক্যের কারণে গীতবাদ্যে অক্ষম হয়ে পড়লে তিনি অবসর সময়ে 'হস্তামল কুবের ও তুলসী দাস কৃত গ্রন্থ অথবা ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক পাঠ' করতেন।

১৭৬১ খ্রিঃ (১১৬৮ বঙ্গাব্দ) রামনিধি 'সুখচর' গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। এরপর তিনি 'নিজ পল্লীস্থ' দেওয়ান রামতনু পালিতের সঙ্গে চিরণ ছাপরায় যান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করতে। ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী' থেকে জানা যায়, উক্ত রামতনু পালিত অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারালে রামনিধিই তখন সেখানে দেওয়ানি পদের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ছাপরার তৎকালীন কালেক্টর মেং মোন্টগুমারি সাহেবের কেরাণী পদাসীন বিখ্যাত জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের ছলনা ও শঠতায় এবং রামনিধির ঔদার্যের ফলে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দেওয়ান পদ লাভ করেন আর রামনিধি তাঁর কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়ে কিছুদিন কাজ করেন এবং ১৭৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

ছাপরায় কালেক্টরি কেরাণীর চাকরি করা কালে রামনিধি সেখানে এক মুসলমান ওস্তাদকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করে তাঁর কাছে সংগীত শাস্ত্র (খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্তি ঘটলে নিধুবাবু বুঝতে পারেন যে ওস্তাদজী তাঁকে প্রকৃত শিক্ষাদানে কার্পণ্য করছেন। তখন তিনি ওস্তাদজীকে এই বলে বিদায়ী সেলাম জানিয়েছিলেন—'আমি তোমাদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দী গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব।' এরপরই নিধুবাবু হিন্দি গানের (খেয়াল, টপ্‌খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি) আদর্শে বাংলা টপ্পা গান রচনা শুরু করেন এবং গানের কথা রচনা করে তাতে সুর সংযোজনা করেন।

এই সময়েই তিনি ছাপরা জেলার 'রতনপুরা' গ্রামে 'ভিখনরাম' স্বামীজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। এই গুরুজী তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন— 'তুমি, সুখী ও খ্যাত্যাপন্ন হও'। বলা বাহুল্য যে গুরুজীর আশীর্বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ছাপরার কালেক্টারির অসাধু পরিবেশ সঙ্গত কারণেই তাঁর মত শিল্পীর পক্ষে প্রীতিকর হয়নি। অসদুপায়ে অর্থোপার্জনকে (দেওয়ান জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় যার প্রত্যক্ষ পোষকতা করতেন) তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে দেওয়ানজীর সাথে তাঁর মনোমালিন্য হয় এবং ফলশ্রুতিতে তিনি ছাপরার কেরাণীর চাকরি ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

নিধুবাবু স্বভাবত সদাহাস্যময় ও সন্তোষচিত্ত ছিলেন এবং সর্বদা আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকতেন। কিন্তু তাঁর প্রথম পুত্র এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রীরও (প্রথমা স্ত্রী) মৃত্যু হলে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। তাঁর অন্তরের এই শোক নিবারণার্থে তিনি এই গীতটি রচনা করেছিলেন,

মনোপুর হোতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন জন।...

এরপর তিনি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে (১১৯৭ বঙ্গাব্দে) মতান্তরে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকো পল্লিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের সাল নিয়ে মতান্তর আছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ-কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় ১১৭৮ সালে ৩০ বৎসর বয়েসে'। 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থেও নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ কাল ১১৭৮ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লিখিত। ঈশ্বর গুপ্ত বা জয়গোপাল গুপ্ত প্রদত্ত তথ্য থেকে এই সময় স্বতন্ত্র। যাই হোক না কেন, নিধুবাবুর এই দ্বিতীয় স্ত্রীরও অকাল মৃত্যু ঘটে। এরপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে ১৭৯৪/৯৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁর কয়েকটি সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল ও তৃতীয় সুখময় দীর্ঘজীবী হয়ে বংশরক্ষা করেছেন। এই দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপালই পিতার 'গীতরত্ন'-র দ্বিতীয়

ও তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পিতার জীবনকাহিনিও তিনি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন।

ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ঠিক কী ধরনের বিষয় কর্মে লিপ্ত ছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবত তাঁর অর্থ উপার্জনের জন্য কোন প্রয়াস করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ছাপরা থেকে চাকরি ছেড়ে তিনি কলকাতায় ফেরার সময় তিনি দশ হাজার টাকা সঙ্গে এনেছিলেন। নিধুবাবু ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময়ের দশ হাজার টাকার মূল্য অর্থনীতিবিদরা নির্ধারণ করতে পারবেন। তবে তা যে জীবন ধারণের জন্য যথেষ্টই তা আমরা সাধারণ মানুষও আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু এই দশ হাজার টাকা কিসের ? তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভবপর নয়। 'কবিজীবনী'তে প্রদত্ত ঈশ্বরগুপ্তের তথ্য থেকে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, নিধুবাবু অসদুপায়ে অর্থোপার্জনে ঘৃণা বশত কেরাণীর চাকরি ত্যাগ করলে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন 'বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম না করেন তবে আপনার প্রাপ্য ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন'। 'কবিজীবনীর'-সম্পাদক ভবতোষ দত্ত মনে করেন 'এটা নিধুবাবুর পূর্বার্জিত অর্থ। প্রথমবার যখন তিনি ছাপরায় এসেছিলেন তখনই সম্ভবত এই অর্থ লাভ করে থাকবেন।' তাঁর এই অনুমানের কারণ তিনি গোলাম হুসেনের 'Suir-ul-mutaqharin'-এ উল্লেখিত সরণের ফৌজদার রামনিধি (যিনি মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় ইংরেজদের অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছিলেন এবং গোলাম হুসেন যাকে 'an ungrateful Bengaly' বলেছেন) এবং গীতিকার রামনিধি একই ব্যক্তি কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এই দুই রামনিধি সম্ভবত একই ব্যক্তি এবং ফৌজদার না হয়ে তিনি সে সময়ে একজন সাধারণ সৈনিক হয়ে থাকতে পারেন এবং সেই সময়েই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই সব অর্থ ফেলে রেখে বা গচ্ছিত রেখে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁর এই সন্দেহের পক্ষে তিনি বলেছেন, যিনি 'নানান দেশের নানান ভাষা' জাতীয় স্বদেশ ও স্বভাষা প্রেমের গান লিখতে পারেন তাঁর চরিত্রে ইংরেজ বিরাগের বীজ নিহিত ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভবতোষ দত্তের এই সন্দেহকে অমূলক বলেছেন। তাঁর মতে ' শুধু নাম সাদৃশ্য ও বাঙালিত্ব ছাড়া দু'জনের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ছাপরা থেকে শেষবারের মতো কলকাতায় ফিরে তিনি শুধু সংগীত চর্চা করেই দিন কাটিয়েছেন বলে মনে হয়। লঙ সাহেব লিখেছেন,

> Nidhu a century ago composed poems sung to this days; he was said to have written the best when he was drunk.

বরদাপ্রসাদ দে লিখেছেন,

> At calcutta he passed his days pleasantly for many long years. He

wrote and sang and sang and write. his fame as a singer spread far wide. Ramnidhi established a society composed mostly of young men for cultivation of music chiefly vocal music.

এরপর রামনিধি কলকাতায় কলাবত বৈঠকি গানের মজলিস স্থাপন করে মার্গ সংগীত ও উচ্চাঙ্গ বাংলা গানের চর্চা করতেন এবং যুব সম্প্রদায়কে সংগীত শিক্ষা দিতেন। শোভাবাজারের কাছে একটি আটচালায় (শোভাবাজার বটতলাবাসী বাবু রামচন্দ্র মিত্রের বাড়ির উত্তরাংশে একটি প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল।) নিধুবাবু প্রত্যেক রাতে সেখানে উপস্থিত হয়ে এই সংগীত চর্চা করতেন। সেখানে উপস্থিত হতেন শহরের প্রায় সমস্ত সৌখিন ধনী ও গুণী জনেরা। তাঁরা নিধুবাবুর মধুময় কণ্ঠ ও সুমধুর সংগীত শুনে মুগ্ধ হতেন। এই আটচালায় বাবু নারায়ণ মিশ্র পক্ষির দল করে সর্বদাই উল্লাস করতেন। এই পক্ষির দলের লোকেরা নিধুবাবুকে 'কত্তা' বলে অত্যন্ত মান্য করত।

সংগীত সাধক হিসেবে নিধুবাবুর নাম যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বাংলা দেশের নানা স্থান থেকে বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করতেন এবং তাঁর সংগীত শ্রবণে প্রীত হতেন। এমনও শোনা যায় যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাত্মা তেজেশচন্দ্র রায়বাহাদুর কলকাতায় এলে কৌশল করে নিধুবাবুর গান শুনেছিলেন।

একসময় মুর্শিদাবাদের দেওয়ান মহারাজ মহানন্দ রায়বাহাদুর কলকাতায় অবস্থান করে নিধুবাবুর সঙ্গে নিয়মিত আমোদ প্রমোদ করতেন। এই মহারাজের শ্রীমতী নামে এক রূপবতী বুদ্ধিশালিনী সংগীত নিপুণা বারাঙ্গনা ছিল। তার কাছে নিধুবাবুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন,

> ঐ বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালোবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা। কিন্তু অনেকে একথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন তিনি লম্পট ছিলেন না। কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক টপ্পা রচনা করিতেন।

সেকালের মজলিসি আড্ডায় ও বৈঠকখানায় নিধুবাবু ও শ্রীমতীকে নিয়ে অনেক রসাত্মক আলোচনা চলত এবং তাদের কেন্দ্র করে অনেক গালগল্প সৃষ্টি হয়েছিল। এ সবের সত্যাসত্য নির্ণয় করা আজ আর সম্ভবপর নয়। 'বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্নমালা' দ্বিতীয় সংখ্যায় এ সংক্রান্ত কিছু কাহিনি আছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ৪র্থ খন্ডে এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে, বন্ধুদের কটাক্ষ ভর্ৎসনায় উত্ত্যক্ত হয়ে নিধুবাবু কিছুদিন শ্রীমতীর কাছে যাননি, শেষে আর থাকতে

না পেরে একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে অভিমানিনী শ্রীমতী নিধুবাবুকে দেখে অনুযোগ করে বলেছিলেন—'অসময়ে বড় যে,— কি মনে করে —দেখা দিতে কি?' এর উত্তরে নিধুবাবু নাকি সিন্ধুভৈরবী রাগিণীতে (মধ্যমান তালে) এই গান করে অভিমান ক্ষুব্ধ প্রণয়িনীকে শান্ত করেছিলেন,

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে।
শ্রী মুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালোবাসি
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে

অবশ্য পরবর্তীকালের সংকলনে গানটি শ্রীধর কথকের আবার কোথাও বা রাম বসুর রচনা হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক হিসেবে বরেণ্য রামনিধির আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি আখড়াই গানের পরিমার্জনা ও উন্নতিসাধন। এ প্রসঙ্গে আখড়াই গানের ইতিহাস বিষয়ে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, 'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন। উহা ১৫০ শত বৎসরের ন্যূন নহে।' এই তথ্য থেকে বোঝা যায় আখড়াই গান অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারতচন্দ্র উল্লিখিত 'খেঁড়ু' ('নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।/নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।।') এবং ঈশ্বর গুপ্ত কথিত শান্তিপুরের আখড়াই গান সম্ভবত একই। শান্তিপুরের আখড়াই গানে থাকত দুটি 'তুক' (অস্থায়ী ও অন্তরা) বা কলি-খেউড় ও প্রভাতি। খেউড়ের বিষয় ছিল আদিরসাত্মক কুরুচিপূর্ণ গান আর প্রভাতির বিষয়-নায়কের অনুপস্থিতিতে নায়িকার বিলাপ। শান্তিপুরের এই আখড়াই গানকে আখড়াই গানের ইতিহাসের প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে। এরপর আখড়াই গান হুগলির চুঁচুড়ায় গিয়ে পৌঁছয় এবং এর আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে। চুঁচুড়ার সম্প্রদায় আখড়াই গানের রূপকলাকে তিনভাগে ভাগ করেন- ভবানী বিষয়, খেউড় ও প্রভাতি। এঁদের গানে সংগীতের কলা কৌশল ছিল এবং অনেক প্রকার (বাইশ প্রকার) বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। তাই কলকাতার সংগীত রসিকেরা এঁদের 'বাইসেরা' বলতেন। এই পর্বকে আখড়াই গানের দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, এঁদের প্রভাবে কলকাতায় কয়েকটি পেশাদার আখড়াই গানের দল গড়ে ওঠে। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। হালসিবাগানে এঁদের সংগীত যুদ্ধ হত। এই পর্যায় আখড়াই গানের তৃতীয় পর্ব। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই পর্বের বিস্তৃতি ছিল। এরপর নিধুবাবুর সম্পর্কে মাতুল (মতান্তরে মাতুলপুত্র) প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কুলুইচন্দ্র সেন শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চতর গায়নরীতির মধ্য দিয়ে কলকাতার সৌখিন আখড়াই গানকে

জাতে তুলতেন। এটা আখড়াই গানের চতুর্থ পর্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কলুইচন্দ্রকে 'আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য' বলে মন্তব্য করেছেন। বস্তুত কুলুইচন্দ্রই আখড়াই গানকে নতুন রূপ দিয়ে (নানা শাস্ত্রীয় রাগ-তাল প্রয়োগ করে এবং বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের মেলক তৈরি করে) একে প্রকৃত বৈঠকি গানে উন্নীত করেন। কুলুইচন্দ্রের পরে নিধুবাবু আখড়াই গানের গায়কী রীতির অনেক পরিমার্জনা করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রবর্তিত রীতিই অনুসৃত হয় এবং সংগীত সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে) নিধুবাবুর নেতৃত্বে কলকাতায় দুটি সখের আখড়াই দল গড়ে উঠেছিল। এ দুটির একটিতে শোভাবাজার ও বাগবাজারের সম্প্রদায় এবং অন্যটিতে মনসাতলা ও পাথুরিয়াঘাটার সংগীত মোদীরা যোগ দিয়েছিলেন। নিধুবাবু বাগবাজারের দলের পক্ষে সংগীত রচনা ও সুর সংযোজনা করতেন (পাথুরিয়াঘাটার দলে এ কাজ করতেন শ্রীদাম দাস। এই সখের আখড়াই দলের শ্রীবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা দেখে পাথুরিয়াঘাটা (ঠাকুরবাড়ী), জোড়াসাঁকো (সিংহ পরিবার), গরাণহাটা (বসাক পরিবার), শোভাবাজার (ঘোষ পরিবার) এবং শ্যাম পুকুরে গড়ে ওঠে আখড়াই গানের দল। এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিধুবাবুর প্রভাব- পুষ্ট বাগবাজারের আখড়াই গানের দলই জয়লাভ করত এবং শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। এর কারণ নিধুবাবুর গীত রচনা ও সুরযোজনা এবং তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য শিষ্য মোহনচাঁদ বসুর মধুক্ষরা কণ্ঠ। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য এই যে মোহনচাঁদের দ্বারাই আখড়াই গানের অধঃপতন ঘটে। নিধুবাবুর স্নেহভাজন সুযোগ্য শিষ্য সংগীত প্রতিভাধর মোহনচাঁদ বসু এই দুরূহ এবং অত্যন্ত জটিল গায়কী রীতি সাপেক্ষ এই আখড়াই গান ভেঙে অপেক্ষাকৃত সহজ গায়কী রীতিসম্মত দাঁড়া কবির আদর্শে হাফ-আখড়াই গানের প্রবর্তন করেন। বিশুদ্ধ কলারসিক বৃদ্ধ নিধুবাবু শিষ্যের এই আখড়াই গান ভেঙে হাফ-আখড়াই সৃষ্টির সংবাদ পেয়ে, শিল্পের এই জাতি নাশে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সক্ষোভে বলেছিলেন,

> 'কি। আমার এত সাধের - এ অসীম বিদ্যাবত্তার পদার্থ যে 'আখড়াই' তাহাকে এই মূর্খটা কিনা ভাঙিয়া চুরিয়া কবির গানে এনে দাঁড় করাইল - অমূল্য নিধি লইয়া বানরের গলায় পরাইল,-এমন আখড়াইকে কিনা 'ফুল' ও 'হাফ' করিয়া তুলিল"।

মনোমোহন বসু বলেছেন, পরবর্তীতে মোহনচাঁদের হাফ আখড়াই গান শুনে নিধুবাবু খুশী হয়েছিলেন এবং শিষ্যকে 'আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ সহিত হাফ-আখড়াই প্রচলনের নিমিত্ত অকপটে অনুমতি দিলেন'। পূর্বে উল্লেখিত শোভাবাজারের বটতলার আটচালায় সংগীত চর্চার আসর বন্ধ হয়ে গেলে নিধুবাবু বাগবাজারে রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাড়িতে পুনরায় সংগীত সাধনা শুরু করেন। কলকাতার উচ্চসমাজের অনেক শিক্ষার্থী ও সংগীত অনুরাগী এখানে এসে সমবেত হতেন। নিধুবাবু এঁদের টপ্পাগান শুনিয়ে তৃপ্ত করতেন। পূর্ব কর্মস্থল ছাপরায় যে টপ্পা গানের

রচনার সূচনা তিনি করেছিলেন, এখানে তা পুরোদমে চলতে লাগল। তাঁর বিখ্যাত টপ্পা গানের অনেকগুলিই এখানে রচিত হয়েছিল। তাঁর টপ্পা গান শোনার আকর্ষণে কলকাতার বাইরে থেকেও অনেক সংগীত রসিক এখানে আসতেন বলে জানা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজেশচন্দ্র রায় বাহাদুর কলকাতায় এসে অনেক আয়াস করে নিধুবাবুর টপ্পা গান শুনেছিলেন।

প্রসঙ্গত টপ্পা গান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানি সংগীতের তিনটি রীতির (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা) অন্যতম টপ্পা। 'টপ্পা' প্রকৃতপক্ষে একটি হিন্দি শব্দ, যার অর্থ-লম্ফ বা উলম্ফন। রূঢ়ি অর্থে- সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ ধ্রুপদ খেয়ালের চেয়ে সংক্ষিপ্ত যে গান তা-ই হল টপ্পা। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি টপ্পার অর্থ করেছেন - 'সংক্ষিপ্ত লঘু প্রকৃতি গীত' ('বাঙ্গালা ভাষা' ২য় ভাগ, প্রথম খন্ড, ১৩২০)। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন, 'ব্যঙ্গোক্তিজনক হাস্যরসাত্মক গানের নাম টপ্পা। ইহার নামান্তর 'কবি' বা 'খেউড়' ('ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা')। 'সঙ্গীত তানসেন'-এ (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) সমস্ত গানকে 'ধ্রুপদ' ও 'রঙ্গিন গান'-এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। খেয়াল ও টপ্পা এই 'রঙ্গিন গানে'র অন্তর্ভুক্ত। ক্যাপটেন উইলার্ড সাহেবের মতে টপ্পা পাঞ্জাবের উট চালকদের গান ('Treatise on the Hindoo Music') । রাধামোহন সেন তাঁর 'সঙ্গীত তরঙ্গ'তে বলেছেন,

পাঞ্জাব হইতে হৈল টপ্পার জনম।
দুই চরণের মধ্যে তাহার নিয়ম।।

টপ্পা গানের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে কেউ কেউ মনে করেন পাঞ্জাবের গোলাম নবী নামে একজন গায়ক পাঞ্জাবি ভাষায় প্রথম টপ্পা গানের প্রচলন করেন। টপ্পার চাল একটু হালকা। তাই সংগীত শাস্ত্রকারদের কাছে টপ্পারীতিতে ভক্তির গান অনুমোদিত নয়। খেয়ালের মতোই টপ্পা গানে ব্যবহৃত হয় দুটি 'তুক' - অস্থায়ী ও অন্তরা। তবে খেয়ালের রাগে টপ্পা রচিত হয় না।

নিধুবাবুর পূর্বে বাংলা ভাষায় টপ্পা রচনার কথা ভাবাই যেত না। তিনিই প্রথম হিন্দুস্থানি খেয়াল-টপ্পার আদর্শে বাংলায় যে শুধু টপ্পা গানের প্রবর্তন করেছিলেন তাই নয়, বাংলা টপ্পাগানের তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। নিধুবাবু প্রণীত ও গীত অদ্ভুত কলা-কৌশলময় বাংলা টপ্পাগান সেকালের কলকাতার বিদগ্ধ সংগীতরসিক নাগরিক সমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি তার প্রভাব— তরঙ্গ বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বয়ে এসে ছিল। বাংলার শ্রেষ্ঠ টপ্পা রচয়িতা নিধুবাবু শ্রেষ্ঠ হিন্দি টপ্পাকার শোরি মিঞার তুল্য বলে খ্যাত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তর ভারতের টপ্পা গানের উদ্ভাবয়িতা এবং হিন্দি টপ্পা গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী শোরি মিঞার প্রকৃত নাম গোলাম নবী। ইনি পাঞ্জাবের অধিবাসী। জন্ম একাদশ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে। গোলাম নবী নিজ রচিত টপ্পায় নিজের নাম গোপন

করে স্ত্রী বা প্রণয়িনী শোরির ভণিতা দিতেন। সেই থেকেই তাঁর রচিত টপ্পা 'শোরি মিঞার টপ্পা' বা 'শোরির টপ্পা' নামে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।) পরবর্তীকালে নিধুবাবুর নামটি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সেই কিংবদন্তির নায়কের প্রকৃত নামটি কি তা অনেকেই জানতেন না। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন,

> বাঙ্গালা গীতে রাগ সুরের ব্যাপারে ইনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে 'সরিমিয়ার' অপেক্ষা ইহাকে কোন অংশেই নূন্য বলা যাইতে পারে না। ইহার (নিধুবাবু) প্রণীত টপ্পাই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে 'সরির টপ্পা' তেমন বঙ্গদেশে 'নিধুর টপ্পা'। অনেকেই 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু, কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি কি ? তাহা জ্ঞাত নহে।

নিধুবাবু সংগীতমোদী সুরসিক হলেও অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সেজন্য সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্ভ্রম ও সমীহ করত। এমনকি কেউ তাঁর নাম বলে সম্বোধন বা ডাকতে সাহস করত না। 'কবিজীবনী' থেকে জানা যায়, "কি সধন কি অধন সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে 'বাবু' শব্দে সম্বোধন করতেন। 'বাবুর বাটি', 'বাবুর সুর', 'বাবুর গীত', 'বাবু এলেন", 'বাবু গেলেন' ইত্যাদি।"

নিধুবাবু গানবাজনা আমোদ আহ্লাদে মগ্ন থাকলেও জীবনাচরণে সংযমী ও মিতাচারী ছিলেন। 'Descriptive Catalogue (1855). popular Songs'-এ রেভাঃ জেমস লঙ যদিও লিখেছেন, 'He was said to have written the best when he was drunk' কিন্তু তাঁর জীবনীর অন্য কোনা সূত্র লঙের একথা সমর্থন করে না। পেশাগত ক্ষেত্রে তিনি যে পরিমন্ডলে বিচরণ করতেন - রাজা রাজড়ার সঙ্গ, গানবাজনার আসর, মজলিশি আড্ডা প্রভৃতি - তাতে সেকালের সমাজের রেওয়াজ অনুযায়ী অল্প স্বল্প মদ্যপান হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তাঁর জীবন যাপনে সংযম ও সুমিতাচারণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। পরিমিত জীবনাচরণের কারণেই অতিবৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁর কোন শারীরিক বৈকল্য ঘটেনি - চোখ, কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক ছিল, মস্তিষ্কও কার্যকরী ছিল স্বাভাবিক রকম। শুধু দুর্বলতার জন্যে তিনি বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন না এই যা। শেষ জীবনে নিধুবাবু রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। জয়গোপাল গুপ্ত 'গীতরত্ন'-র দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৬৩ বঙ্গাব্দ) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব উপাচার্য্য উচ্ছাবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এক দিবস রামনিধি বাবুকে আদেশ করিলেন মহাশয় একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে। সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন , যথা—
>
> রাগ বেহাগ তাল আড়া
>
> পরম ব্রহ্ম তৎ পরাৎপর পরমেশ্বর
> নিরঞ্জন নিরাময় নির্ব্বিশেষ সদাশ্রয়,

আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর।।
সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানাজ্ঞান যথা বাস
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার।
অন্নময় প্রাণময় মানস বিজ্ঞানময়,
শেষেতে আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর।। ১

জয়গোপাল প্রদত্ত তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই ব্রহ্মসংগীত শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি এই সংগীত দেওয়ানজীকে (রামমোহন রায়) দেখিয়ে ব্রাহ্মসমাজে গান করাবেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুর কারণে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভবপর হয়নি।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, শেষ জীবনে নিধুবাবু ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি বাল্যকালে এক ইংরেজ মিশনারীর কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বরদাপ্রসাদ লিখেছেন,

> English also he studied, for a knowledge of that language was then as now a recognised passport to preferment in the government service.

মৃত্যুর কিছু পূর্বে নিধুবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের রচিত টপ্পার একটি সংকলন 'গীতরত্ন' নামে প্রকাশ করেছিলেন ১২৪৪ বঙ্গাব্দে (১৮৩৭ খ্রিঃ)। এর ভূমিকায় তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। অতি জনপ্রিয়তার ফলে তাঁর অনেক গানের কথা তাঁর জীবদ্দশাতেই লোকমুখে বিকৃত হতে শুরু করেছিল। সে জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন ('গীতরত্নে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,—'এই গীতসকলের অল্প ২ অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল'।) তাই গানগুলিকে তিনি ছাপার কথা ভেবেছিলেন। 'গীতরত্ন'-র পূর্বেও কয়েকটি গানের সংকলন বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল যেমন, জয়নারায়ণ ঘোষালের, 'করুণানিধানবিলাস' (?১৮২০ খ্রিঃ), রাধামোহন সেনদাসের' 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১২২৫ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি, কিন্তু টপ্পা জাতীয় গানের সংকলন বাংলা ভাষায় এই প্রথম। উক্ত ভূমিকাংশে নিধুবাবু লিখেছেন,

> বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যথার্থ সম্পূর্ণ রূপে অভিনব নহে, তথাপি এ ভাষার এমত গ্রন্থ অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারে না।

নিধুবাবু নিছক সংগীত হিসাবে টপ্পাগুলি রচনা করেছিলেন এবং একজন সংগীত শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর গানগুলি প্রকাশ করেছিলেন। তাই দেখা যায় পুস্তিকার পরিশিষ্টে রাগ রাগিণীর তালিকা, গাইবার সময় প্রভৃতির স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন। নিধুবাবু রচিত টপ্পা হিন্দুস্থানি টপ্পা গানের অবিকল অনুকরণ নয়। এ প্রসঙ্গে 'গীতরত্ন' র ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

> এই গীতসকলে আলাপচারির দ্বারা যে সকল তান বসিয়াছে তাহা কোন হিন্দুস্থানী খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়া দেওয়া এমত নহে, অথচ করণ মাত্র রাগ

রাগিণীর অবিকল বুঝাইতেছ।

এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন,

> হিন্দুস্থানী গানের মাছিমারা নকল না করে নিধুবাবু প্রকৃতপক্ষে বাংলা টপ্পা গানের মধ্যে বাংলা মার্গরীতির মৌলিক গানের পরিকল্পনা করেছিলেন।

নিধুবাবু তাঁর টপ্পা গানে সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এক রাগের সঙ্গে অন্য রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। নিধুবাবুর ভাষায়—'রাগদ্বয়ে এবং রাগিণীদ্বয়ে মিলাইয়া কত গীত প্রকাশ করিলাম'

নিধুবাবু রাজা বরদাকণ্ঠ রায়ের রচিত অপূর্ণ টপ্পা গান সম্পূর্ণ করেছিলেন একথা 'গীতরত্ন'এ উল্লিখিত হয়েছে। 'গীতরত্ন' প্রকাশের কিছুদিন পরেই ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শনিবার নিধুবাবুর জীবনাবসান হয়। The Friend of India (April 11, 1839) নিধুবাবুর মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করে লিখেছিল,

> A native lyric poet of the name of Nidhiram Gupta, usally called Nidhu baboo, who was at the same time one of the oldest inhabitants in Bengal is just dead at the age of eighty. His songs were very celebrated among his won countrymen and were collected and printed two years ago.

'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'তে নিধুবাবুর বয়স সঠিক উল্লিখিত হয়নি। দীর্ঘজীবি রামনিধির জীবনাবসান ঘটেছিল আটানব্বই বছর বয়সে।

২

নিধুবাবু রচিত আটটি আখড়াই গান মুদ্রিত হয়েছে 'গীতরত্ন'-র দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৬৩ বঙ্গাব্দ)। 'গীতরত্ন'-র প্রথম সংস্করণে (১২৪৪ বঙ্গাব্দ) এই গানগুলি মুদ্রিত হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে নিধুবাবুর দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত এই দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন। অর্থাৎ নিধুবাবুর জীবিতকালে তাঁর রচিত আখড়াই গানগুলি প্রকাশিত হয়নি—নিজের গীত সংকলনে তিনি এগুলির ঠাঁই দেননি। সুতরাং এতে এমন মনে হওয়াই সম্ভব যে আখড়াই গানগুলি প্রকাশে তাঁর মত ছিল না। এর কারণ কী হতে পারে তা আজ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়। এমন হতে পারে যে এই আখড়াই গানগুলিকে তিনি টপ্পার চেয়ে নিম্ন মানের মনে করতেন এবং তাই সেগুলি প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেননি।

নিধুবাবু রচিত আখড়াই গানের ('গীতরত্ন'-র দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী) নিদর্শন উদ্ধৃত হল—

১। ভবানী বিষয়

মালেশ্রী

গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে। (গিরিবর ওহে)
না হেরি তনয়ামুখ হৃদয় বিদরে।।

ত্বরান্বিত হও গিরি তোমার করেতে ধরি।
উমা ওমা বলে দেখ ডাকিছে আমারে।।১।।

খেউড়

খাম্বাজ

এ সুখে অসুখ কেন চাহরে করিতে। (দেওরা ওরে)
মিলন হয়েছে দেখ কত যতনেতে।।
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
যে ভাবে হলো অভাব, ভাবিতে ২।।১।।

প্রভাতি

ভৈরবী

ওই রে অরুণ আলো কামিনী দহিতে। (দেওরা ওরে)
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে।।
না হতে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোরী চাঁদের আশা তেজিল দুঃখেতে ১।।

২। ভবানী বিষয়

বাগেশ্বরী

ত্বমেকাভুবনেশ্বরী, সদাশিবে শুভঙ্করী,
নিরানন্দেআনন্দদায়িনী। (মা)
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধ সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী।।
প্রাণেতে প্রসন্ন ভব, ভীমতরভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি
পদতরিদেহগোতারিণি।।

খেউড়

বেহাগ

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল (দেওরা ওরে)
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।।
সাধিয়ে আপন কাজ এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল যে লাজ বিষাদ হইল ।।১।।

প্রভাতি

ললিত

জামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন। (দেওরা ওরে)
হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন।।

নলেনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
অসুখে অসুখে কবে করে কি অরুণ।।

নিধুবাবুর আখড়াই গানগুলির মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই; কবিত্বগুণও এগুলিতে তেমন একটা মেলা না। আসলে এসব গানের বাণী নয়, গায়কী রীতি এবং বাদ্যযন্ত্র সম্বলিত সংগীত কলা কৌশলের জন্যই গানগুলি সেকালের সমাজে এত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং উচ্চাসন লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য যথার্থ—' ইহাতে কেবল সুর ও রাগ-রাগিণীর পান্ডিত্য এবং বাদ্যের পারিপাট্য' আখড়াই গানে ভবানী বিষয়ক গানের পরে যে খেউড় গাওয়া হত তাতে সাধারণত আদিরস ও অশ্লীল ভাবেরই প্রকোপ ও প্রাধান্য থাকত। সম্ভবত কৃষ্ণনগরের দরবারি আদর্শের প্রভাবেই শান্তিপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের খেউড় গানে এই অশ্লীলতার প্রাধান্য। তবে নিধুবাবুর খেউড় গানে আদিরস থাকলেও তাতে অশ্লীলতা ছিল না। 'গীতরত্ন'-এ মুদ্রিত তাঁর আখড়াই গানগুলিতে (খেউড় ও প্রভাতি অংশে) নিষিদ্ধ প্রেম ব্যাকুল নায়ক—নায়িকার অন্তরের আনন্দ ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

নিধুবাবু সমকালে ও পরবর্তীকালে সংগীতরসিক সমাজে শ্রদ্ধার উচ্চাসন লাভ করেছিলেন তাঁর টপ্পা গানগুলির জন্য। হিন্দি টপ্পা গানের অনুসরণে বাংলায় টপ্পা রচনার এক অভাবিতপূর্ব সাধনযজ্ঞে তিনি আত্মনিয়োজিত করেছিলেন এবং বলা বাহুল্য তাতে তিনি পুরোপুরি সফল হয়েছেন। বাংলা টপ্পা গানের তিনি শুধু জনকই নন, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ টপ্পাকার ও গায়ক। আধুনিক যুগের টপ্পা গায়কেরাও নিধুবাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। নিধুবাবু নিজের টপ্পা গানগুলিকে অসাধু জনের হাত থেকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে 'গীতরত্ন' (১২৪৪ বঙ্গাব্দ) নামে যে স্বরচিত সংগীত সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জয়গোপাল সম্পাদিত 'গীতরত্ন'-র তৃতীয় সংস্করণে (১২৭৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সংকলিত 'সাতটি আখড়াই সংগীত ও একটি ব্রহ্মসংগীত ('পরমব্রহ্ম ত্বং পরাৎপর পরমেশ্বর'), একটি শ্যামা বিষয়ক ('ককারে আকার ... ছাড়ি লয়ে দীর্ঘাকার বল'), একটি স্বরস্বতী বিষয়ক ('শারদে বাণী ত্রিনয়ণী বাকবাদিনী') ও একটি ভাষা বিষয়ক ('নানান দেশে নানান ভাষা') গান বাদ দিলে প্রণয় বিষয়ক টপ্পার সংখ্যা মোট অষ্টনব্বই।" নিধুবাবু তাঁর 'গীতরত্ন'-র (প্রথম সংস্করণ) নির্ঘন্টে প্রত্যেকটি গানের রাগও গাইবার সময় নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য অন্যান্য প্রকাশকদের হাতে এই বিশুদ্ধি সর্বদা রক্ষিত হয়নি।

বিভিন্ন সঙ্কলনে কোন কোন গান নিধুবাবুর নামে চিহ্নিত হলেও সেগুলি তাঁর রচনা কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। যেমন 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে', 'ঐ যায়, যায়, চায় ফিরে সজল নয়নে', 'তবে কি সুখ হৈত', 'সখি আমায় ধরো ধরো' প্রভৃতি গান নিধুবাবুর নামে চললেও দূর্গাদাস লাহিড়ী ('বাঙ্গালীর গান') এবং

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ('বঙ্গভাষার লেখক') এই গানগুলিকে শ্রীধর কথকের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কখনও বা একই গান (যেমন 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে') কোন সঙ্কলনে নিধুবাবুর রচনা হিসেবে, অন্য কোন সঙ্কলনে রাম বসুর রচনা হিসেবে আবার কোথাও বা শ্রীধর কথকের রচনা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে 'গীতরত্ন'-র তিনটি সংস্করণের কোনটিতেই উল্লেখিত হয়নি এমন কিছু গান বাংলা সংকলনে নিধুবাবুর রচনা বলে প্রচারিত হয়েছে। যেমন- 'নয়নের দোষ কেন' , 'তোমার তুলনা তুমি', 'তবে প্রেমে কি সুখ হৈত' প্রভৃতি। বিপরীতে আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে 'গীতরত্ন'-এ মুদ্রিত নিধুবাবুর কোন কোন গান কেউ কেউ নিজের রচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এসবের কারণ এই যে নিধুবাবু রচিত সমস্ত গান 'গীতরত্ন'-র তৃতীয় সংস্করণেও সংকলিত করা সম্ভবপর হয়নি এবং সর্বোপরি নিধুবাবুর বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা।

নিধুবাবুর টপ্পা গানগুলির প্রায় সবই প্রণয়মূলক। এর বাইরে তিনি মাত্র চারটি গান [একটি ব্রহ্মসংগীত, দুটি ভক্তিগীতি (একটি শ্যামা ও সরস্বতী বিষয়ক) এবং একটি বাংলা ভাষার গৌরবগাথা] টপ্পার আদর্শে রচনা করেছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাংলাভাষার বন্দনামূলক গানটি উদ্ধার করা হল,

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।।
কত নদী সরোবর কি বা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।।

শোরী মিঞা নামে বিখ্যাত গোলাম নবীর প্রণয়মূলক টপ্পা গানের আদর্শেই নিধুবাবু তাঁর টপ্পাগুলি রচনা করেছিলেন। সমকালে বা কিছু পূর্ব থেকে বাংলায় প্রচলিত ও প্রচারিত কবিগান বা দাঁড়াকবি গানের অন্যতম আঙ্গিকগত পর্যায় 'সখীসংবাদ' ও বিরহ'-এর গানের সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পার একটা ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'সখীসংবাদে' রাধার ঐশী প্রেমের ছায়া থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব নর-নারীর ব্যাকুল হৃদয়-বেদনার আলেখ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর 'বিরহ'-র প্রধান উপজীব্যই তো বাস্তবের মানবীয় প্রেম। নিধুবাবুর টপ্পা গানগুলির কয়েকটি মাত্র নায়কের উক্তি। এগুলি বাদ দিলে প্রায় সবই নায়িকার উক্তি। এগুলির মধ্য দিয়ে একটা মর্ত্য বাসনানুরঞ্জিত নারী মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়, যার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর বিপ্রলব্ধা বা খন্ডিতা নায়িকার ছায়ারূপ ফুটে ওঠে। চতুর নায়ক ছলনা করে অন্য নায়িকার গৃহে রজনী যাপন করলে বিরহ বেদনার্ত নায়িকা নায়কের এহেন অবহেলা, ছলনা ও নিষ্ঠার অভাবে কখনো বিষণ্ন চিত্তে বিলাপ করে, কখনো বা অভিযোগ করে, আবার কখনো বা তাকেই দেখার জন্য তার চিত্ত

আকুল হয় -

যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ
সদাই চাতুরী করে সেই জন
দেখিতে তাহারে হইল সাধ রে
কাহারে দুঃখ কহিব।

কিংবা

এই কি তোমার প্রাণ, ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে।।
অবলা সরলা সতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে।।

কখনো বা দেখি খন্ডিতা নায়িকার অভিমানাহত মর্মস্পর্শী খেদোক্তি -

নিশি পোহাইয়ে প্রাণনাথ প্রভাতে আইলে হে।
আমার আশার সুখ কারে বিলাইলে।।

আবার কখনো বা কাতর দয়িতার কণ্ঠে ঝরে পড়ে দয়িতের উদ্দেশ্যে তার করুণ মিনতি,

হে প্রাণনাথ, নয়ন অন্তরে তুমি যাইও না।
প্রবল বিরহানলে, জ্বলাইও না।।
এসো হে নয়নে রাখি, পলকে মুদিয়া থাকি,
না দেখ, না দেখি কারে, এই বাসনা

কখনো আবার প্রেমাকুল নায়িকার উচ্চারণে শোনা যায় দেহাতীত রোমান্টিক প্রেমের আর্তি,

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন।।

আবার নায়িকা যখন সখীর কাছে, দয়িতের প্রতি তার আন্তরিক ভালবাসা অকপটে প্রকাশ করে, তখন তার সেই বক্রতা কুটিলতাহীন সরল স্বীকারোক্তি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে,

কত ভালবাসি তারে সই, কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত, মম অঙ্গ সব।।
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব।।

নিধুবাবুর এই সব টপ্পা গানগুলিতে নায়িকার যে ভাবাবয়ব তথা প্রেমের যে আলেখ্য ফুটে ওঠে তা যেমন দেহাতীত, অতীন্দ্রিয়, ভাব-বাষ্পায়িত নয়, আবার তেমনি তা একান্তভাবে দেহাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়সর্বস্বও নয়। অনেক সময়ই সেখানে নায়িকার উক্তিতে রোমান্টিক প্রেম সৌন্দর্যের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

নায়ক-নায়িকার প্রেম ও মিলনের ছবি পারস্পরিক আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতায় মনোরম হয়ে ফুটে উঠেছে নীচের দৃষ্টান্ত দুটিতে। নায়িকার উক্তি, নায়কের প্রতি,

তুমি হলে রাজেন্দ্র আমি তব দাসী।
তোমার অধীন হয়ে থাকি ভালবাসি।।
করি অনেক সাধন, এমন হয়েছে মন,
ইহাতে সদয় থাক, সুখী দিবানিশি।।

নায়কের প্রত্যুত্তর,

তুমি মোর সুখের কারণ প্রিয়সি।
সদা উল্লসিত হেরি মুখশশী।।
রাজেন্দ্র যদি লো আমি, রাজেন্দ্রাণী হলে তুমি।
উভয় পিরীতে হয়, দাস কেহ দাসী।

নায়িকার এই দাসীত্ব একান্তই স্বেচ্ছাধীন— ঐকান্তিক নৈষ্ঠিক অহংমুক্ত আত্মসমর্পণোন্মুখ প্রেমের উৎসেই এর জন্ম। একনিষ্ঠ প্রেমই নায়কের পদতলে নায়িকাকে সমর্পণ করিয়ে আপন সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। অন্যদিকে নায়কের উক্তিতে যখন নায়িকাই তার সুখের ও ঐশ্বর্যের কারণ বলে প্রতিভাত হয় তখন তা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ও লিরিক কবি রবীন্দ্রনাথের 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট'-এরই পূর্বাভাস বলে মনে হয়। প্রেমের পরশমণির স্পর্শেই সামান্য নরনারী রাজেন্দ্র রাজেন্দ্রাণীতে পরিণত হয়, প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতার ধূলিমালিন্য মুক্ত হয়ে ঐশ্বর্যের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হয়— এই অনুভবটি নিধুবাবুর গানে খুব সুস্পষ্ট রূপাবয়ব লাভ করতে না পারলেও এর মধ্যেই আগামীদিনের গীতিকবিতার মর্ত্যপ্রেমই অস্পষ্টভাবে আভাসিত হয়েছে তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> এই টপ্পাগুলির মধ্যে পুরুষের উক্তিতে প্রেমের সমগ্র রূপটি ঠিক ফুটে না উঠলেও নায়িকার বিরহ ও বিলাপ, শঠ নায়কের ছলনায় নায়িকার মনোভঙ্গ, প্রেমবৈচিত্ত্য, আবার আত্মনিবেদনের কম্পমান আবেগ, দুর্বল রচনাভঙ্গিমা সত্ত্বেও চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের নীতিঘেঁষা উন্নাসিক উক্তি ('আত্মবিসর্জনে পরাঙ্মুখ আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র') নিধুবাবুর টপ্পায় প্রয়োগ করা যাবে না। তাঁর টপ্পাগান

নিছক গান হলেও এর মধ্যে প্রেমের একটি স্নিগ্ধ আনন্দময় প্রসন্ন ভোগাকাঙ্ক্ষা, কখনও বা বেদনামধুর বিরহের ব্যাকুলতা দেহহীন বাসনার দীপাধারে উত্তাপহীন শুভ্র শিখা জ্বালিয়ে তুলেছে।

S.k Dey তাঁর 'History of Bengali Literature' গ্রন্থে নিধুবাবুর টপ্পাগানে 'intense realism of passion' আছে বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয়,

নিধুবাবুর কোন কোন টপ্পায় বস্তু জগতের কিছু পাঞ্চভৌতিক শরীর স্পর্শ থাকা বিচিত্র নয়, এবং সেই স্পর্শ আছে বলেই এগুলি বায়বীয় লোকের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির রাজ্যে নির্বাণ লাভ করেনি।

নিধুবাবুর টপ্পার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই বিচার্য, তা হল গীতিকবিতা (lyric poem) হিসেবে তাঁর টপ্পা কতখানি সার্থক? গান হিসাবে তাঁর টপ্পা কিংবা কলাকার হিসেবে নিধুবাবু যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তাঁর টপ্পার লিরিক গুণ কি সেই মাত্রা স্পর্শ করতে পেরেছে? রাগ, সুর, ভাব, গায়কী রীতি, বাদ্যযন্ত্র সহকারে সাংগীতিক কলাকৌশল প্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাবে নিধুবাবু রচিত ও গীত টপ্পা গান রসিক শোতৃমন্ডলীর কাছে জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছিল, কিন্তু সত্যের খাতির স্বীকার করতে হয় তাঁর গানের বাণীরূপ খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। শব্দযোজনা, মিল বিন্যাস, স্তবকবন্ধন ও রূপকল্প নির্মাণ কিংবা অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। পাঠ্য লিরিক কবিতা হিসেবে এগুলি খুব একটা শিল্প-সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি। আসলে নিধুবাবু তাঁর টপ্পা গানগুলির সুর, রাগ-রাগিণী ও ভাবের প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন; গানের বাণীরূপ নিয়ে তত বেশি ভাবিত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্য অতি যথার্থ,

নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর, এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাইলে মানুষের মনকে যে প্রকার আদ্র করে মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্ত সুখকর হয় না। ... ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন, সেই সময়ে যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে সোনার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদুর পর্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য হইত তা কথনীয় নহে।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিধুবাবুর টপ্পাগানের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে তাঁর টপ্পার চেয়ে 'শ্রীধর কথক ও কালী মির্জার প্রেমসংগীত এমন কি রাম বসু ও হরু ঠাকুরের সখী সংবাদ বিরহ পর্যায়ের কবিগান অনেক বেশী সুখপাঠ্য' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ড. সুশীল কুমার দে 'The fine poetic quality of Nidhu Baboo and the dull flatness of Kali Mirja' মন্তব্য করে নিধুবাবুর টপ্পার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমাদের মনে হয়, নিধুবাবুর সমস্ত টপ্পা উচ্চাঙ্গের কবিত্বগুণসম্পন্ন নয় কারণ প্রকতপক্ষে তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের গীতিকার. সরকার.

এবং সংগীতশিল্পী; উচ্চাঙ্গের কবি নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অনেক টপ্পাতেই কবিতার সৌন্দর্য ও মাধুর্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। নিধুবাবুর এমনই কিছু গান ও গানের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল,

১ নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল।।
তৃষ্ণায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে।
ধারা জল বিনে তার সকলি বিকল।১।
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল।।১।।

২ কি সুখ দেখ না ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাসে মোর পরশে পরশে।।
ভেকে বাজাইছে ভেরী সমীরণ বীণ-ধারী,
চাতকী আলাপে পিউ, মনের হরিষে।।

৩ তোমার সাধনা করি, সাধ না পূরিল।
মনের যে সাধ তাহা মনেতে রহিল।।
তোমা বিনা কোন জন, তুষিবে আমার মন,
জানিয়া না কর তুমি, বিষম হইল।।

৪ কাজল নয়নে আর, দিও না কখন।
শরে কেবা নাহি মরে, বিষযোগ তাহে কেন।।

৫ কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না

কালগত কারণে হয়ত বা নিধুবাবুর গানের ভাষাভঙ্গী, শব্দপ্রয়োগ বা স্তবক নির্মাণে দাঁড়াকবিদের সখীসংবাদ বিরহ গানের ছাপ সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হতে পারেনি, কিংবা গানের লিরিক গুণের বিচারেও হয়ত কালী মির্জা বা শ্রীধর কথকের তুলনায় তাঁর গান কিছুটা নূন্য বলে কেউ কেউ মনে করেন কিন্তু নিধুবাবুর কৃতিত্ব অন্যত্র যা তাঁকে ঐতিহাসিক গৌরব ও মর্যাদা দান করেছে। নিধুবাবুর পূর্বে বাংলায় টপ্পা গান রচনা বা গাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারতেন না। নিধুবাবুই সর্বপ্রথম হিন্দি টপ্পার আদর্শে ও অনুসরণে বাংলা ভাষায় টপ্পা গান রচনা করেছিলেন এবং শুধু রচনাই নয়, এতে সুর সংযোজনা ও গায়কী রীতির প্রতিষ্ঠা, অনুশীলন এবং এই গানের শিক্ষা দান— এ সমস্ত কিছুর গৌরবের অধিকারী নিধুবাবুই। এবং তাঁর এই গানেই সর্বপ্রথম মর্ত্য মানব-মানবীর হৃদয়ের আনন্দ বেদনা, অনুরাগ - বিরহ ধুলো মাটির স্পর্শে ঐহিকতার সুরে বেজে উঠেছিল—বাংলা গীতিকবিতার অস্পষ্ট আভাস মিলেছিল, সে যুগে যা ছিল একেবারেই নতুন। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষা ও

সাহিত্য' প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য স্মরণীয়,

> প্রাচীন সাহিত্যে কবি নিধু রায় (গুপ্ত) স্বতন্ত্র প্রথাবলম্বী, ইনি প্রেম সংগীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধাকৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাইয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা।

সেকালের প্রেক্ষিতে নিধুবাবুর প্রেম সংগীতগুলির স্বরূপ বৈশিষ্ট্যটি যথার্থ ও চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সুধী সমালোচক ভবতোষ দত্তের এই উক্তিতে,

> ... নিধুবাবুর প্রেমের গানগুলির মধ্যে একটা অনুভূতি বেজে উঠল, সে অনুভূতি আপন অন্তরের রহস্য রসে স্নিগ্ধ। ... বৈষ্ণবীয় প্রেমের সঙ্গে এর যোগ নেই, শাস্ত্রের বিধি দিয়ে এ প্রেম নির্ধারিত নয়। ব্যক্তির প্রেমানুভূতির এক স্বাধীন বিকাশ ঘটল এই গানগুলিতে। ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়দ্বারকে উন্মোচিত করে কবি এবার সত্যই-আত্ম আবিষ্কার করলেন। নিধুবাবুর প্রেমের কল্পনায় সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়তা নেই, এ-কথা সত্য। তার প্রেম দেহাশ্রয়ী, দেহাতীত নয়। তবু প্রেমের বিচিত্র মুহূর্তগুলিকে তিনি গানে গেঁথে দিয়েছেন। এই বৈচিত্র্য শাস্ত্র-সম্মত বা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু মানব হৃদয়ের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে তিনিই প্রথম স্বীকার করে নিলেন। নিধুবাবুর কোন কোন গান রবীন্দ্রনাথের গানকে কখনো কখনো মনে করিয়ে দেয় প্রেমের বিচিত্র রূপ কল্পনার জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কল্পনায় প্রকৃতির পরিবেশ অসাধারণ ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে যা নিধুবাবুর কাব্যে নেই। কিন্তু প্রেমের অফুরন্ত ভঙ্গি এবং তার কমনীয়তা এই চিরকালের হৃদয়ানুভূতিতে এক গভীর প্রত্যয় এবং অবিচল মগ্নতা এনে দিয়েছে, যা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল।

নিধুবাবুর গানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত , যেগুলি রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানকে স্মরণ করিয়ে দেয়,

১ কাজল নয়নে আর দিও না কখন।

২ আমারে কি তার আছয়ে মনে
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরি হে কাঁদি
নিরখিয়ে থাকি পথপানে।

৩ নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল।

৪ মনে করি বারে বারে নাহিক হেরিব তারে।

নিধুবাবু এই নতুন ধরনের গান - টপ্পা গান - রচনা করে, সুর দিয়ে, গায়কী রীতি প্রতিষ্ঠিত করে যে সংগীত শিল্প ধারার প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন তা পরবর্তীতে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী সংগীত কলামোদী ও সংগীত রসিক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আখড়াই, হাফ-আখড়াই গানের চর্চা ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পা গানের চর্চার

ধারা দীর্ঘদিন প্রবাহিত ছিল। এমনকি বিশ শতকেও, টপ্পা গানের গায়কের সংখ্যা দ্রুত কমে এলেও, টপ্পার চর্চা পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে যায়নি। বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ টপ্পা গায়ক হিসেবে কালীপদ পাঠকের নাম এ প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে মনে পড়বে। যাই হোক উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানি সংগীতের তিনটি রূপের (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা) অন্যতম এই টপ্পা গানকে একটা বিশিষ্ট মার্গ রীতির বাংলা গানে রূপান্তরের আদি শিল্পী হিসেবে এবং মর্ত্য মানব-মানবীর বাসনা-রক্তিম হৃদয়ানুভূতির প্রথম কাব্যিক ভাষ্য নির্মাতা রূপে 'নিধুবাবু' নামে বিখ্যাত রামনিধি গুপ্ত বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও সংগীতকলার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল।

গ্রন্থঋণ

১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী; ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত
২. গীতরত্ন; জয়গোপাল গুপ্ত সম্পাদিত
৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; দীনেশচন্দ্র সেন
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ খন্ড); অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫. History of Bengali Literature ; S.K. Dey